নামের নামাবলি

মুহম্মদ জুবায়ের

১.

ঝুম্পা লাহিড়ির *দ্য নেমসেক* পড়তে পড়তে মনে হলো, এই উপন্যাসটি আমার লেখার কথা ছিলো। অন্য কারো এমন মনে হয় কী না জানি না, হলে সেসব বলে ফেলার দস্তুর আছে কী না, তা-ও জানা নেই। কিন্তু আমার এরকম মনে হয়েছে এই বইয়ের মূল চরিত্রটির নামঘটিত বিড়ম্বনার কারণে।

উপন্যাসের মূল চরিত্র গোগোল গাঙ্গুলি আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয় পিতামাতার সন্তান, জন্মসূত্রে মার্কিন। অথচ তার গোগোল নামটি না মার্কিন, না ভারতীয়। পিতা অশোক গাঙ্গুলি পুত্রের এই নাম রেখেছিলেন নিজের জীবনের একটি মর্মান্তিক ঘটনার স্মারক হিসেবে। তরুণ বয়সে অশোক একবার এক রেল দুর্ঘটনায় জীবন হারাতে বসেছিলেন। মারাত্মক আহত অবস্থায় যখন তাঁকে উদ্ধারকর্মীরা উদ্ধার করে আনে, তখন তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা নিকোলাই গোগোলের বইয়ের একটি পৃষ্ঠা, বইটি নিখোঁজ। ঘটনাটিকে তাঁর অলৌকিক মনে হয়েছিলো। তাঁর বিশ্বাস জন্মায়, গোগোলই তাঁকে নবজন্ম দিয়েছেন। পুত্রের জন্ম হলে সেই ঘটনাটি স্মরণ করে তার নাম দিলেন গোগোল। পুত্র ক্রমশ বড়ো হতে হতে তার নাম নিয়ে সংকুচিত বোধ করতে থাকে। টের পায়, আশেপাশের সব মানুষের কাছেই তার নামটি খাপছাড়া। মার্কিন স্থানীয়রা তো বটেই, এমনকী আশেপাশের ভারতীয়দের কাছেও গোগোল নামটি যুগপৎ কৌতূহল ও কৌতুকের বিষয়। এই নাম তাকে বিচিত্র রকমের পরিস্থিতিতে বিচিত্রভাবে অস্বস্তি দেয়, সংকুচিত করে রাখে, আহত করে, পলায়নে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নামটি সে বদলে ফেলে। তার নতুন নাম হয় নিখিল। অতঃপর পিতা একদিন যখন তাকে গোগোল নামকরণের ইতিবৃত্তটি বয়ান করেন, গোগোল হতভম্ব হয়ে যায়।

গোগোলের মতো আমি মার্কিনি হয়ে জন্মাইনি, তবে মার্কিন দেশে আসার পর নাম নিয়ে বহু রকমের গোলযোগের মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। এখনো হচ্ছে। বস্তুত এই বিড়ম্বনা আমার সারা জীবনের সঙ্গী। আমার জন্মের আগে পিতামাতার একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যায়। আমার জন্মানো এবং টিকে যাওয়ার ঘটনাটি পিতামাতার মনে বিরাট কোনো আশার সঞ্চার করে থাকবে। ফলে, আমাকে উপহার দেওয়া হয় বিশাল একটি নাম অথবা নামাবলি – আবু হোসেন মুহম্মদ জুবায়ের। নামের মিছিল বললেও বলা যায়। এর সঙ্গে একটি ডাক নামও – মুকুল। বহু অক্ষর ও শব্দবিশিষ্ট নামের এই বিপুল ভারেই সম্ভবত আমি না-ফোটা বা অস্ফূট মুকুল হয়ে থেকে গেলাম জীবনভর। ছোটোবেলা থেকেই দীর্ঘ নামটি কাউকে বলতে আমার সংকোচ হতো। আবুল কাশেম ফজলুল হক বা আবুল আসগার মোহাম্মদ মাকসুদ হোসেন জাতীয় নামকরণ বাঙালি মুসলমান পরিবারে মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অস্বস্তি যে হতো তা বেশ মনে আছে। অবশ্য তার স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই। তখন জানি না পরিব্রাজক ইবনে বতুতার পুরো নাম শামস আল-দীন আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে বতুতা আল-লাওয়াতি আল-তানজি।

যতোদিন স্বদেশে বসবাস করেছি, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-অফিসে-আদালতে সর্বত্রই ভুল বানানে আমার নাম লেখা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আবু হোসেন পর্যন্ত ঠিক আছে, কোনো গোলযোগ নেই। কিন্তু মুহম্মদ-এ এসেই গোলমালের শুরু – সর্বমোট চার রকম করে বাংলায় লেখা হয়ে থাকে এই

নামটি – মোঃ, মোহাম্মদ, মুহম্মদ এবং মুহাম্মদ (পশ্চিম বঙ্গীয়রা আবার মহম্মদ লিখতে বেশি স্বচ্ছন্দ)। আমারটি যে কীভাবে লেখা হবে, তার খবর অন্যের কাছে থাকার কথা নয়। কেউ জিজ্ঞাসা করারও দরকার মনে করে না, নিজের পছন্দ বা সুবিধামতো লিখে ফেলে। আবার ঘনিষ্ঠজনরা ছাড়া আর প্রত্যেকের কাছেই জুবায়ের নামটি কিম্ভূত কিছু একটা। যুবায়ের, জোবায়ের, যুবায়েদ, জোবায়েদ, এমনকী জোবায়দুর ইত্যাকার বিচিত্র বানানে আমার নামটি লিখিত হবে, তা একরকম ভবিতব্য ভেবে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। তখনো বুঝিনি, কপালে আরো কতো দুঃখ লেখা আছে এবং এই নামাবলির জ্বালাতন আমাকে জীবনভরই সহ্য করে যেতে হবে।

এস.এস.সি-র রেজিস্ট্রেশনের সময় ক্লাসটিচার বললেন, তোর লম্বা নামটা ছেঁটে দিই, কী বলিস?

তা দিলেন তিনি ছেঁটে – যা সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ালো এ.এইচ.এম. জুবায়ের-এ। খুশি বা অখুশি ব্যপার ছিলো না, জিনিস তো ঘুরেফিরে সেই একই। এখন ভাবি, সেই সময়ের শিক্ষকরা কিছু দুঃসাহসী ছিলেন। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম অনায়াসে বিনা অনুমতিতে ছেঁটে দিলেন, কোনো প্রতিবাদ হলো না। এখন কী এরকম সম্ভব হতো?

সংক্ষিপ্ত নামটি খোদাই হতে লাগলো আমার কপালে এবং ক্রমে আমার যাবতীয় সার্টিফিকেটে, আনুষ্ঠানিকতায় এবং পাসপোর্টে। কলেজে ঢুকতে যুদ্ধ শুরু, দেশ স্বাধীন হলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে তখন আ.স.ম. আবদুর রবের অনুকরণে (তারও আগে অবশ্য আ.ন.ম. বজলুর রশীদ ছিলেন, কিন্তু ধরণটি তখনো বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি) আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক বা আ.ক.ম. রবিউল আলম জাতীয় নাম লিখিত হতে শুরু করেছে। সুতরাং বিপুল উৎসাহে আ.হ.ম. জুবায়ের লিখতে লাগলাম। পরে কিঞ্চিৎ লেখালেখি করার বাসনা হলে মনে হলো, এখন করি কী? স্ফুটনোন্মুখ লেখকের নাম হিসেবে এ.এইচ.এম. জুবায়ের বা আ.হ.ম. জুবায়ের একেবারেই অচল। সেই সময়ে আবার মূল নামের সঙ্গে ডাকনাম যোগ করে লেখার চলও হয়েছে। যেমন, আবদুল কুদ্দুস মাখন। মাখন সহযোগে পুরনো ধাঁচের আবদুল কুদ্দুস নামটিও পাতে দেওয়া যায় বেশ সাড়ম্বরে। অতএব, মুহম্মদ জুবায়ের মুকুল নামধারণ করা গেলো কলমনাম হিসেবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে ঘটনাচক্রে *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার সঙ্গে কিঞ্চিৎ জড়িত হয়ে পড়ি। একদিন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বললেন, তোমাদের নামের সঙ্গে এই ডাকনাম জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কী, বলো তো? এখন থেকে দশ-পনেরো-বিশ বছর পরের কথা ভাবো একবার। তোমার ছেলেমেয়েরা বড়ো হলে তোমার মুকুল নামটা তাদের জানা কী খুব দরকারি? আমার নিজের একটা ডাকনাম আছে (সায়ীদ ভাই নামটি বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর অপছন্দ বলে উহ্য রাখছি)। শুনলেই কুকুরের নাম মনে হয় (সেই সময় কুকুরের নাম সেরকম হতো বটে, ইদানিং হয় না)। এখন আমার নামের সঙ্গে ডাকনামটি লিখলে আমার মেয়ে লুনা কী ভাববে?

নামের ব্যাপারে জনমভর আমি বড়ো নাজুক অবস্থায়। সায়ীদ ভাইয়ের কথায় মুকুল ছেঁটে ফেলা গেলো। কয়েক বছর পর, সেই সময়ে উঠতি এবং এখন খ্যাতিমান, আমার এক লেখক বন্ধু বলেছিলো, মুহম্মদ জুবায়ের নামের কারো পক্ষে ভালো লেখক হওয়া কোনোদিন সম্ভব নয়। নামের শুরুতে মুহম্মদ থাকলে কী লেখক হওয়া যায়?

উঠতি লেখক হিসেবে তখন দুঃখ পেয়েছিলাম, অস্বীকার করি কী করে? এখন ভাবি, আমার সেই লেখক বন্ধুটি কী ভালো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলো! লেখক হওয়া আমার হয়নি ঠিকই, ভালো লেখক হওয়া তো

দূরের কথা। আমার স্বনামধন্য বন্ধুটিকে লেখক হিসেবে সবাই এক নামে চেনে, বন্ধুগর্বে গর্বিত হতে আমার অবশ্য কোনোদিন কোনো সমস্যা হয়নি। মাঝে মাঝে কৌতূহল হয়, মুহম্মদ জাফর ইকবাল সম্পর্কে আমার বন্ধুটি কী মনে করে?

মার্কিন দেশে হিজরত করা হলো পাসপোর্টে এ.এইচ.এম. জুবায়ের নাম নিয়ে। এ দেশে বসবাসের প্রথম শর্ত হলো দুটি জায়গায় নিজের নামটি তালিকাভুক্ত করে পৃথক দুটি নম্বরের মালিক হওয়া। একটি সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর এবং দ্বিতীয়টি ড্রাইভারস লাইসেন্স (গাড়ি না চালালে আই ডি কার্ড) নম্বর। এই দুটি নম্বর দিয়ে যে কারো সুলুক-সন্ধান করা হয়ে থাকে। গলার তাবিজের মতো এই নম্বর দুটো গায়ে সেঁটে থাকবে। চাকরি করতে, বাড়ি ভাড়া নিতে, গাড়ি কিনতে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে সর্বত্রই লাগবে এই দুই নম্বরের যে কোনো একটি। অথবা দুটিই।

আবেদন করার পর সময়মতো ডাকে চলে এলো নম্বরসহ সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড এবং ড্রাইভারস লাইসেন্স। কিন্তু আমার বিদঘুটে অচল নাম দিয়ে যে নতুন একটি ঘণ্ট তৈরি সম্ভব, তা কল্পনায়ও ছিলো না। মাঝখানের যতিচিহ্নগুলো উড়ে গিয়ে প্রথম তিনটি অক্ষর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যা হয়েছে সেটি উচ্চারণের সাধ্য বা বাসনা কোনোটাই আমার হয়নি। এ দেশে অধিকাংশ মানুষের নামের তিনটি অংশ – ফার্স্ট নেম, মিডল নেম এবং লাস্ট নেম। যেমন, জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি। ফার্স্ট নেম এ ক্ষেত্রে জন, যা সাধারণত ডাকনাম হিসেবে চালু হয়ে যায়, ব্যতিক্রম কেউ কেউ মিডল নেমটিও ডাকনাম হিসেবে ব্যবহার করে। লাস্ট নেমটি অবশ্যই পারিবারিক পদবী এবং সেই নাম ধরে ডাকার চল নেই, যদি না সঙ্গে মিস্টার বা মিস/মিসেস জুড়ে দেওয়া হয়। আমার ক্ষেত্রে একটি লাস্ট নেম পাওয়া যাচ্ছে (যদিও সেটি আমার পারিবারিক পদবী নয় বললে এরা হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে), কিন্তু বাকি দুটো কোথায়? একটিমাত্র অক্ষর তো আর একেকটি নাম হতে পারে না! সুতরাং আহ্ম্ জুবায়ের হিসেবে বিদঘুটে আরেকটি নতুন নাম আমার কপালে লটকে গেলো। ঘাটে ঘাটে ব্যাখ্যা দিতে হয় আমার নামটি এরকম কেন, এর অর্থ কী, আসলে আমার ফার্স্ট নেম কী, লাস্ট নেম ধরে ডাকা আমি কেন পছন্দ করি ইত্যাদি। এ দেশে বাস করছি আঠারো বছর। গড়ে দিনে একবার এরকম ব্যাখ্যা দিতে হলেও এ পর্যন্ত আমাকে সাড়ে ছ'হাজার বারেরও বেশি একই কথা বলতে হয়েছে। আমার পিতামাতার জানা নেই, বাক্য অপচয়ের কী ভয়াবহ ব্যবস্থাপত্র তাঁরা আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ভালোবাসার বশে।

সুতরাং আমি দাবি করতেই পারি, গোগোল-কাণ্ডটি আমার লেখার কথা ছিলো, ঝুম্পা লাহিড়ির নয়। ঝুম্পা আমার মতো প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী নন বলে অনুমান করি (বড়োজোর এ দেশীয়রা তাঁকে ঝুম্পা না বলে জুম্পা উচ্চারণ করেছে), তাঁকে হয় বানিয়ে লিখতে হয়েছে, অথবা অন্য কারো অভিজ্ঞতা শুনে। কিন্তু তারপরেও বাস্তব হলো এই যে, ঝুম্পা সমস্যাটি খুবই ভালোভাবে নাড়াচাড়া করেছেন এবং লিখতে পেরেছেন। আমি পারিনি।

২.

বিদেশে বাঙালিদের নামগুলোর যে কী দুরবস্থা হয়, তা একটু দেখা যাক। আমরা যারা আগেই নাম ধারণ করে এ দেশে এসে পৌঁছেছি, তাদের কথা প্রথমে বলি। রংপুরের শওকত চৌধুরীকে এখানে শ্যন চৌধুরী হতে হয়েছে। বগুড়ার মতিউর রহমান এখন মার্টিন রহমান। সিলেটের তাজুল পরিচিতি পেয়েছে টি জে হিসেবে। সিলেটের আরেকজন আলী নেওয়াজ চৌধুরী গোগোলের মতো কোর্টে গিয়ে মাঝখানের

নেওয়াজটিকে অক্ষত রেখে ডাস্টিন এন. ব্র্যাডলি নাম ধারণ করেছে। চট্টগ্রামের মাকসুদ হয়েছে ম্যাক্স। নামের শুরুতে মোহাম্মদ থাকার কারণে লক্ষ লক্ষ বাঙালি মুসলমানের সবাই একরকম বাধ্যতামূলকভাবে মোহামেদ নামে পরিচিত এ দেশে। পারিবারিক পদবী কাজী বা সৈয়দ আমাদের দেশে নামের শুরুতে লেখার রেওয়াজ। ফলে যাবতীয় কাজী এবং সৈয়দরা কাজী বা সাঈদ হয়ে থাকছে।

কিন্তু এ দেশে জন্মানো বাচ্চাদের নাম বাংলায় রাখলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার দুর্গতি লক্ষ্য করার মতো। মেয়ের নাম অথৈ। চমৎকার নাম! মেয়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করতেই শিক্ষকসহ এ দেশীয় সবার মুখে মুখে তার নাম হয়ে গেলো আটোই। সহ্য হয়! এক কবিবন্ধু ছেলের সুন্দর নাম রেখেছে - রোদ্দুর! ভাবলেই মন ভালো হয়ে যায়। অথচ এই ছেলের পক্ষে এ দেশে শুষ্কং কাষ্ঠং রড নামে পরিচিত না হওয়া একরকম অসম্ভব। আরেক বন্ধুর ছেলের নাম রবিন, এ দেশে এটি মেয়েদের নাম হিসেবে চালু। সামি নামের ছেলেটির নাম কালক্রমে স্যামি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ।

এসব উল্লেখ করার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, পরবাসী আমরা বাংলা নাম বা পছন্দমতো নাম রাখবো না বা রাখা উচিত নয়। যা দরকার তা হলো সামান্য সতর্কতা, যাতে বড়ো হয়ে উঠতে-বসতে এই ছেলেমেয়েদের গোগোলের (এখানে পড়তে হবে আমার) দশা না হয়। এই সতর্কতার নমুনা: মেয়ের নাম দেওয়া হয়েছে অদ্রি, অনুবাদে ইংরেজিতে অড্রে হিসেবে দিব্যি চলে যায়। অতিসতর্ক কোনো কোনো বাঙালি বাবা-মা ছেলের নাম দিয়েছেন এরিক বা রিচি। মেয়ের নাম অ্যানি বা অ্যাঞ্জেলা। এগুলো সম্ভবত আরেক চরমে। কিন্তু তা গোগোল-অভিজ্ঞতার ফসল হতেই পারে।

৩.

সেলিব্রিটিদেরও এলেবেলে নাম থাকে। কিন্তু এই মানুষগুলি সেলিব্রিটি হয়ে উঠলে হেঁজিপেঁজি খুব সাধারণ নামেও অনন্যতার ছাপ পড়ে। যেমন রাজনীতির শেখ মুজিবুর রহমান বা তাজউদ্দিন আহমদ। টিভির আফজাল হোসেন বা আবুল হায়াত। ফুটবলের সালাউদ্দিন বা এনায়েত। ক্রিকেটের মোহাম্মদ আশরাফুল। চলচ্চিত্রের রাজ্জাক বা ফারুক। খ্যাতিমান লেখকের না হলে সৈয়দ শামসুল হক নামটি কিন্তু অন্য দশটা নামের মধ্যে দিব্যি একাকার হয়ে যায়। এই নামগুলোর মধ্যে কোনো আপাত-জৌলুস কিছু নেই। কিন্তু এঁদের কীর্তি বা অর্জন নামগুলোকে উজ্জ্বলতা দিয়েছে। একটি আ-কার সহযোগে শামসুর রহমান নিজেকে আলাদা করে ফেলেছেন শামসুর রাহমান হিসেবে।

অন্যদিকে কোনো কোনো নাম শুনলে মনে হবে এঁরা আলাদা কিছু না হয়ে পারেন না। যেমন, জহির রায়হান। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

আবার শিল্প-সাহিত্যে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা, বিশেষ করে কবি ও চলচ্চিত্রশিল্পীরা এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, কলমনাম বা পর্দানাম ধারণ করে থাকেন নিজেদের সাধারণ থেকে আলাদা করে ফেলার জন্যে। পপি নামের মেয়েটি হয় ববিতা। বরিশালের আবুল হোসেন কবি হয়ে যায় আবুল হাসান নামে। কিশোরগঞ্জের হাবীবুর রহমান হয় আবিদ আজাদ। টাঙ্গাইলের নূরুল ইসলাম খান থেকে মাহবুব হাসান। নারায়ণগঞ্জের গোলাম মাওলা শাহজাদা হয় হাসান হাফিজ। যতোদূর জানি রফিক আজাদ, সেলিম আল দীন, শিহাব সরকারও কলমনাম।

অনেক বিচিত্র নামের মুখোমুখি কমবেশি আমরা সবাই হয়েছি। এককালে আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিলো অত্যন্ত বেশি, পেছনে তাকালে জন্মেই মারা যাওয়া শিশুর গল্প প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই একাধিক পাওয়া যাবে। এসব ক্ষেত্রে বাবা-মা সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর জন্যে নির্বাচন করতো বিচিত্র নাম, অনেক ক্ষেত্রে অতি বাজে, এমনকী শ্লীলতার প্রচলিত ধারণার বিপরীত। সংস্কারবশে মনে করা হতো, যমের চোখ বা মনোযোগ এরকম নামধারীদের ওপর পড়বে না। ব্যাঙ্গা বা পচা এই ধরনের নামের খুব সাধারণ ও চালু নমুনা। অল্প কিছুদিন আগে সিলেটে পুলিশের হাতে অযথা হেনস্থা হওয়া আপাত-অশ্লীল নামধারী একজন খবরের কাগজে শিরোনাম হয়ে আসছিলেন বেশ কয়েকদিন ধরে।

এইসব নামের সবগুলো হয়তো বাবা-মায়ের দেওয়া নয়। পাড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধুদের কল্যাণে অনেক নাম চালু হয়ে যায়, এমনকী এই আরোপিত নামের পেছনে আসল নামটি হারিয়েই যায়। স্কুলে হুমায়ূন কবির (ডাকনাম বাচ্চু) নামের আমাদের এক সহপাঠীর নাম হয়ে গেলো আটচল্লিশ। এর কোনো কার্যকারণ উদ্ধার করা যায়নি। ছাত্র হিসেবে মেধাবী ছিলো সে, তার রোল নম্বর দুই-তিনের মধ্যে থাকতো। তবু তার নাম কেন যে আটচল্লিশ কে জানে! তার আসল নাম একসময় প্রায় সবাই ভুলে গেলো। একই সময়ে খসরু পরিচিতি পায় বাতাস নামে। আরেক সহপাঠী (তার আসল নামটি মনে নেই) খ্যাতি পায় জালিম নামে। মল্লিককে সবাই জানতো পোত্যা নামে। বগুড়ায় মরিচকে পোত্যা বলা হয়। মরিচের মতো সরু ও লম্বাটে বলে তার ওই নামকরণ। আমাদের স্কুলের গেম টীচারকে সবাই চিনতো কোব্বাদ স্যার হিসেবে। কোব্বাদ নামের বিড়ি বাজারে তখন জনপ্রিয় ছিলো এবং সেই বিড়িতে আসক্তির কারণেই নাকি তিনি নামটি অর্জন করেছিলেন। আরেকজন শিক্ষক পরিচিত ছিলেন আদিব স্যার নামে। ষাটের দশকে উর্দূ ছবির বিখ্যাত ভিলেন আদিবের সঙ্গে তাঁর চেহারার খুব মিল ছিলো, এমন বলা শক্ত। তবু এইসব নামকরণ কোথা থেকে কীভাবে হয়, তার ঠিক আছে?

নাম সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত করে ফেলার নমুনাও কমবেশি সবারই জানা। কক্সবাজারের বাহারকে বলা হবে বাহাইজ্জা। কোটালীপাড়ার সারোয়ার হয়ে যাবে সরো। ঢাকার মিলন মিলইন্যা। কুমিল্লার মজিদ মইজ্জা। মার্কিন দেশে সংক্ষিপ্তকরণের কিছু নমুনা: উইলিয়াম = বিল/বিলি/উইলি। চার্লস = চাক/চার্লি। রিচার্ড = ডিক/রিক/রিচি। টমাস = টম/টমি। রবার্ট = বব/ববি। অ্যালবার্ট = অ্যাল। ভিক্টোরিয়া = ভিকি। সুজান = সুজি। রেবেকা = বেকি। এলিজাবেথ = লিজ/লিজা/লিজি। এডওয়ার্ড = এডি। মাইকেল = মাইক।

নামের সঙ্গে বিশেষণ বা কোনো একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ যোগ করে দেওয়ার রেওয়াজও আছে। যেমন শূন্যে লাফিয়ে উঠে উড়ন্ত অবস্থায় অসম্ভব সব কান্ড ঘটানোর ক্ষমতার কারণে বাস্কেটবলের মাইকেল জর্ডানের নাম হয়েছিলো এয়ার জর্ডান। কিন্তু এই সবিশেষণ বা পরিচিতিসূচক নামকরণকে একটা আলাদা মাত্রায় নিয়ে গেছে আমাদের দেশের কথিত সন্ত্রাসীরা – কালা জাহাঙ্গীর, সুইডেন আসলাম, পিচ্চি হান্নান, গালকাটা কামাল, মুরগি মিলন, কুত্তা জহির ইত্যাদি।

৪.

আমার পুত্রের জন্যে বাংলা নাম নির্বাচন করায় আমার ধর্মপ্রাণ শ্বশুর কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, একটা মুসলমান নাম রাখলে হতো না?

কী করে তাঁকে বলি, নামের হিন্দু-মুসলমান হয় না! ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ, আবু তালেব বা খোদেজা নামগুলি চালু ছিলো। এগুলোকে মুসলমান নাম বলা যাবে

কোন যুক্তিতে? পাল্টা যুক্তি আসতে পারে, এগুলো অন্তত আরবি নাম তো বটে। ঠিক কথা। কিন্তু ইসলাম ধর্মে কোথায় বিধান দেওয়া আছে যে মুসলমানের নামকরণ আরবি হতেই হবে? নামকরণ ব্যাপারটি মানুষেরই আবিষ্কার, তার নিজের প্রয়োজনে। প্রয়োজনটি বহুবিধ হলেও মূল ধারণাটি নিশ্চয়ই ছিলো, একজনকে আরেকজনের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা। সেটি শ্রুতিমধুর বা অর্থপূর্ণ কিছু হলেই চলে, ধর্মীয় বিবেচনা কতোটা প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যেতেই পারে।

আমার এক বন্ধু – নাম আবু জাফর – কয়েক বছর আগে সৌদি আরবে যায় চাকরি নিয়ে। এই ধরনের নামকে আমরা মুসলমান বা আরবি নাম বলে জানি। কিন্তু সৌদি আরবে পৌঁছে বিপত্তি হয়, কী আশ্চর্য, আরব দেশে তার এই আরবি নাম নিয়েই! তাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, এটা কী করে তোমার নাম হয়? এই নামের অর্থ হচ্ছে জাফরের পিতা। তাহলে তোমার নামটি কোথায়?

নাসিরউদ্দিন হোজ্জার গল্পে যেমন ছিলো, আধসের মাংস খেয়ে ফেলা বিড়ালকে দাঁড়িপাল্লায় তুলে ওজন করে দেখা গেলো তার ওজন আধসের। হোজ্জা বললেন, এই যদি বিড়াল হয়, তাহলে মাংস কোথায় গেলো? আর এটা মাংস হলে বিড়ালটা কোথায়?

অনেক প্রামাণ্য কাগজপত্র দাখিল করে আমার বন্ধুটি সৌদি আরবে তার নতুন কর্মক্ষেত্রে আবু জাফর হিসেবে নিজেকে বহাল করতে সক্ষম হয়! অর্থ না বোঝার অনর্থ আর কী।

আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। ঢাকায় একবার আমাদের অফিসে একটা ফোন রিসিভ করেছি। ফোনের অন্য প্রান্তের ভদ্রলোক আমার এক সহকর্মীকে চাইলেন। সহকর্মী অনুপস্থিত জানিয়ে বললাম, কিছু বলতে হবে কী না। ভদ্রলোক বললেন, মজুমদার ফোন করেছিলো জানালেই হবে।

ভদ্রলোককে পুরো নাম বলতে অনুরোধ করি, কারণ আমার সহকর্মীর সঙ্গে অন্তত তিনজন মজুমদারের নিয়মিত যোগাযোগ আছে বলে আমি জানি। ভদ্রলোক কিছুতেই পুরো নাম বলবেন না, আমিও নাছোড়বান্দা। শেষমেশ ভদ্রলোক সসংকোচে নামটি বললেন, বস্ত্রহরণ মজুমদার।

ভাবলাম, আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে ভদ্রলোক আমাকে বোকা বানানোর জন্যে বানিয়ে নামটি বলেছেন। পরে জেনেছি, ওটি তাঁর আসল নাম, সংকোচ সেই কারণেই। এমন নামও বাবা-মা রাখেন!

৫.

আমাদের দেশে কিছু কিছু মানুষের নাম দেখে তাঁদের গ্রামের বাড়ির খবর পাওয়া যায়। যেমন, শফি বিক্রমপুরী। কলিমুল্লাহ আক্কেলপুরী। চরমোনাইয়ের পীর বা আটরশির পীরের আসল নাম কেউ কি জানে? নামবৈচিত্র্যের আরো নমুনা: চাষী নজরুল ইসলাম, সুরুজ বাঙালি। এগুলোর কোনোটাই পারিবারিক পদবী নয়, বাবা-মা এরকম নাম দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা শক্ত। এগুলো আসলে ধারণ করা নাম।

খ্যাতিমান কিছু মানুষের পুরো নামের সঙ্গে ডাকনামটি এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে দুটোকে আলাদা করার আর উপায় নেই। মেনন বাদ দিয়ে রাজনীতিক রাশেদ খানকে কেউ চিনতে পারবে? বা সেলিম-বিহীন মুজাহিদুল ইসলামকে? লেখক ইমদাদুল হক মিলনও এই দলের একজন। এঁদের অনুকরণে আজিজুর রহমান আজিজ বা শহীদুল ইসলাম শহীদ জাতীয় নামও লেখা হয়, যেখানে ডাকনামটি যোগ করা অনাবশ্যক মনে হতেই পারে।

অনেক সমাজেই একসময় পারিবারিক পেশাটিকে পদবী হিসেবে নেওয়ার চল ছিলো। কাজী, তালুকদার, জায়গীরদার, সরদার, গোল্ডস্মিথ, শুমেকার এই গোত্রে পড়ে। একসময় প্রামাণিক, সাহা, ঘোষ, শীল বা চক্রবর্তী পদবী দেখে বোঝা যেতো কার কী পেশা। আজকাল আর এইসব পদবী অনেক ক্ষেত্রেই কোনো অর্থ বা ইঙ্গিত বহন করে না। আমার এক ভারতীয় সহকর্মীর পদবী কিংখাবওয়ালা। পেশায় আই টি প্রফেশনাল।

অনেক নাম আছে, শুনে বোঝার উপায় নেই চরিত্রটি পুরুষ না মেয়ে। আমার নিজের ডাকনামটি এই গোত্রে পড়ে, মুকুল নামের একাধিক মেয়েকে আমি চিনি। মঞ্জু, নিতু, শিমুল, শাহিন, বকুল এইসব নামও চট করে মালিক বা মালকিনের লিঙ্গ-পরিচয় নির্দেশ করে না।

মার্কিন দেশেও এমন নাম পাওয়া যায়। ছেলেদের ক্রিস্টিয়ান বা মেয়েদের ক্রিস্টিনা নামের সংক্ষিপ্ত রূপ ক্রিস, কিন্তু ক্রিস জোনস নাম শুনলে কী উপায়ে বোঝা যাবে সে ছেলে না মেয়ে?

কর্মোপলক্ষে কিছুকাল সিঙ্গাপুরে বসবাস করতে হয়েছিলো। সেখানে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ চীনা বংশোদ্ভুত। প্রথম প্রথম কিছুকাল তাদের নামকরণের ধরণ-ধারণ বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। লাভ কিছু হয়নি। কাজকর্মের সূত্রে পরিচিত এক স্থানীয় চীনা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওদের নাম দেখে ছেলে বা মেয়ে বোঝার কোনো সূত্র বা উপায় আছে কী না। সে জানালো, খাঁটি চীনা নাম হলে কোনো আশা নেই। তবে এইসব ঘোচানোর জন্যে আজকাল পারিবারিক পদবীটি ঠিক রেখে ইংরেজি ধাঁচের নাম রাখা হচ্ছে। যেমন দেখো, আমার নাম ক্যামেরন, আমার বোনের নাম রাখা হয়েছে জুলি।

৬.

বাঙালি মুসলমান পরিবারে নামকরণের যে বিশৃঙ্খলা, তা আর কোথাও কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে আছে বলে আমার জানা নেই। শতকরা নব্বই বা তারও বেশিরভাগ পরিবারে বাবার সঙ্গে ছেলের নামের কোনো মিল পাওয়া যায় না। আবদুল কাদেরের পুত্র অনায়াসে আমিনুল হক হতে পারে। হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং আহসান হাবীব – জানা না থাকলে আমাদের দেশের এই তিন খ্যাতিমানের নাম পাশাপাশি বসিয়ে দিলে এঁদের সহোদর হিসেবে শনাক্ত করা অসম্ভব। অথচ অন্য দেশে শেখ মুজিবর রহমান ও জিয়াউর রহমানকে সহোদর বলে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব।

নামকরণের এই অব্যবস্থাটি কীভাবে কবে শুরু হয়েছিলো তা নিয়ে গবেষণা কেউ করেছেন বলে শুনিনি। তবে হওয়া দরকার বলে মনে হয়। পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে বাঙালি ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত পথে হাঁটতে অভ্যস্ত। কিন্তু ছেলেমেয়েদের নামকরণের ব্যাপারে সেই বাঙালি এমন অর্গলমুক্ত স্বাধীনতা নিতে গেলো কেন? এর পশ্চাতে সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণ অবশ্যই আছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণও হওয়া জরুরি। কথা উঠতে পারে, আমাদের জীবনে-সমাজে এতো এতো সমস্যা থাকতে নামধাম নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী, সময় কোথায়? ঠিক কথা। কিন্তু ক'টা জরুরি কাজকে আমরা জরুরি হিসেবে মানছি? অথবা সেসব বিষয়ে সামাজিক-রাষ্ট্রিক পর্যায়ে কিছু করে উঠতে পারছি? পারলে এই বঙ্গদেশে হেজাবের প্রচলন হতে পারতো না, ভুঁইফোঁড় কোনো ভাইয়ের উত্থান ঘটতে পারতো না, সন্ত্রাস-অন্যায়-অনাচার সামাজিক-রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সহায়তা পেতে পারতো না, অপরাধীরা সমাজের মাথায় উঠে বসে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে পারতো না। এগুলোও

ভেবে দেখার বিষয়। যদি সব সমস্যার সমাধান পাওয়া গেলে গেলে তবে আমাদের চিন্তাভাবনা বা আচার-আচরণের শৃঙ্খলার কথা ভাববো বলে আমরা ঠিক করি, সে মুহূর্তটি আমাদের জীবনে কখনোই আসবে না।

তার চেয়েও জরুরি একই পরিবারের সন্তানদের নামকরণের বেলায় কিছু শৃঙ্খলা ও সতর্কতা। বাধ্যবাধকতার কথা নয়, প্রশ্নটি অসঙ্গতিগুলো ঘুচিয়ে ফেলার। এখানে বিশাল কোনো সমষ্টিগত উদ্যোগের দরকার নেই, দরকার নেই রাষ্ট্রীয় বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দের। কেবল চাই ব্যক্তিপর্যায়ে কিছু সচেতনতা ও উদ্যোগ।

সব বিচারেই গোগোল গাঙ্গুলি অথবা আবু হোসেন মুহম্মদ জুবায়ের ওরফে এ.এইচ.এম. জুবায়ের ওরফে আ.হ.ম. জুবায়ের ওরফে মুহম্মদ জুবায়ের মুকুল ওরফে মুহম্মদ জুবায়ের ওরফে আহ্‌ম্‌ জুবায়ের-এর অভিজ্ঞতা কিন্তু খুব সুখের নয়।